# রবীন্দ্রনাথের কালান্তর

## একালের চোখে

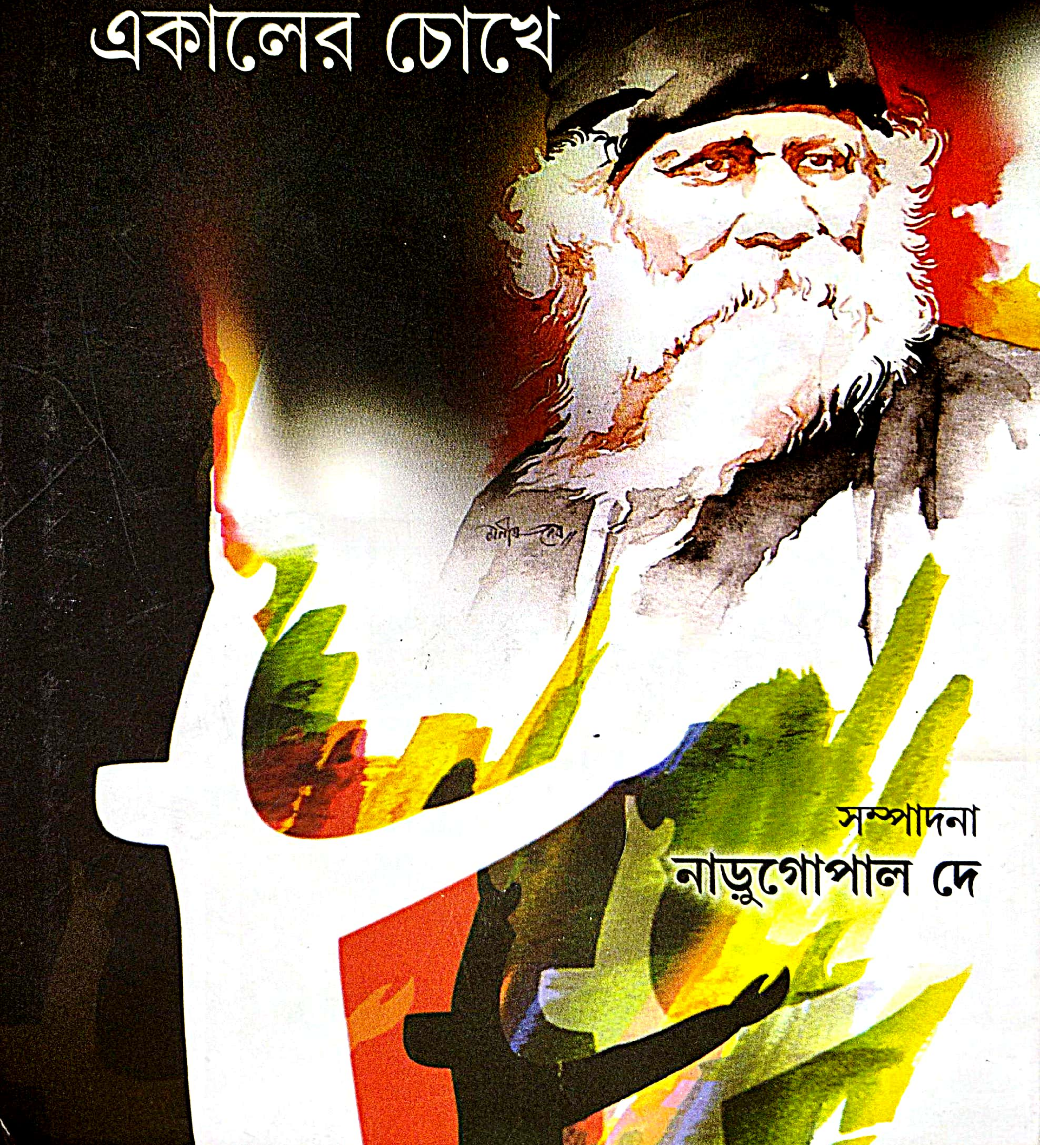

সম্পাদনা

নাড়ুগোপাল দে

রবীন্দ্রনাথের কালান্তর
একালের চোখে

# রবীন্দ্রনাথের কালান্তর
## একালের চোখে

সম্পাদনা

নাড়ুগোপাল দে

বিগ বুক্স

**বিগ বুক্‌স**

২৭ জি কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ ২০১৭

© রাজশ্রী দে

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের কোনো
ধরনেরই প্রতিলিপি অথবা পুনরুৎপাদন করা যাবে না।
এই শর্ত অমান্য করা হলে উপযুক্ত আইনি
ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্য কোনোরকম বাঁধাই বা প্রচ্ছদে এই বইটি কোনো ব্যক্তি অন্য
কোনো ব্যক্তিকে দিতে পারবেন না এবং বইটির অন্য
কোনো গ্রহীতার ক্ষেত্রেও তাঁকে এই একই
শর্ত আরোপ করতে হবে।

ISBN 978 93 86528 74 2

বর্ণ সংস্থাপন বিগ বুক্‌স

মুদ্রণ নিউ এস এস প্রিন্টার্স ১৬/২ ক্যানেল ইস্ট রোড, কলকাতা ৭০০০৬৭

২০০.০০

বরুণকুমার চক্রবর্তী পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

# অবতরণিকা

*কালান্তর* (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি ১৯৩৭ সাল) রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধের সংকলন। এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধের শিরোনামও 'কালান্তর'। প্রবন্ধ গ্রন্থের শিরোনামেই ধরা আছে রবীন্দ্রমানসে নতুন কালচেতনার ছাপ। মূল গ্রন্থাংশে প্রবন্ধ ছিল তেরোটি, সব ক-টি সাময়িকপত্রে পূর্ব প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশের কাল ১৩২১ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে। বর্তমান *কালান্তর* (পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা) গ্রন্থের প্রবন্ধের সংখ্যা বত্রিশটি। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে (*সবুজপত্র, প্রবাসী, পরিচয়, শান্তিনিকেতনপত্র, আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ*) প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২১ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের মধ্যে। বর্তমান গ্রন্থের (ভাদ্র ১৪১৭) প্রথম প্রবন্ধ 'কালান্তর' প্রকাশিত হয় ১৩৪০ বঙ্গাব্দে (*পরিচয়*, শ্রাবণ ১৩৪০), শেষ প্রবন্ধ 'সভ্যতার সংকট' প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে (*প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮)। *কালান্তর* গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি কালানুক্রমিক নয়, বিষয়ানুক্রমিক, কোনো সংহতিও পরিলক্ষিত হয় না—যদিও প্রবন্ধগুলি বিচিত্র বিষয়ক। তৎসত্ত্বেও সব ক-টি প্রবন্ধই সমকালীন নানা ঘটনা কিংবা ভাবনাকে ধরে গড়ে তোলা। বিচ্ছিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে লেখা *কালান্তর*-এর রচনাগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য এবং পার্থক্য থাকলেও ঐক্যের একটা সূত্রও আছে। সে ঐক্য হল কালান্তর-চেতনা।

ভূদেব চৌধুরী *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা,* চতুর্থ পর্যায়ে লিখলেন :

> যে সময়সীমায় 'কালান্তর' প্রবন্ধাবলীর জন্ম—১৯১৪-১৯৩৭ পৃথিবী জুড়ে, সারা ভারতে, এবং বাংলাদেশেও তখন ইতিহাসের সংঘাতময় অজস্র তরঙ্গ ক্ষোভ জটিলাবর্তিত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, যুদ্ধশেষে

> বিশ্বব্যাপী মানুষের আত্মবিশ্বাসহারা বিসর্পিলতা, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বর্বরতম উৎপীড়নের প্রকাশ ও প্রসার, রাজনীতির জগতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর বিস্ময়কর আবির্ভাব এবং তার বহুর ঐতিহাসিক ফল পরিণাম, সমাজ-জীবনে অর্থনৈতিক অবরোধ-পীড়িত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শহুরে বাঙালির জীবিকা ও জীবনমূল্যের সংকট, বাংলা সাহিত্যে তার নূতন প্রতিক্রিয়া—আরো সব উত্থান-পতনের উত্তালতা রবীন্দ্র-মনে তাদের অভিক্ষেপ রচনা করেই চলেছিল। তারই উন্মোচন বিচিত্র প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ। এসব রচনার তাৎকালিক মূল্য যত, ঐতিহাসিক স্মরণীয়তাও তার সমতুল।

—উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও *কালান্তর*-এর আলোচনায় সমালোচকের উক্ত মন্তব্যটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক।

ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নানা তথ্য সমালোচকের দেওয়া বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি :

> ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীনতার জন্য অসহযোগ আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলনের তত্ত্বের সঙ্গে কার্যক্রম রূপায়ণের মিল না থাকায় রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ভাবে গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা করলেও স্কুল কলেজ ত্যাগ করে ছাত্রদের বেরিয়ে আসা, কাপড় পোড়ানো প্রভৃতি সমর্থন করতে পারেননি। চরকার প্রতি কংগ্রেস কর্মীদের যে অটল আস্থা ছিল রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলেন না। এই সব কারণে তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের অনেকের মত পার্থক্য ছিল। তথাপি দেশব্যাপী গান্ধীবাদী আন্দোলন এবং বিপ্লবীদের হিংসাত্মক সংগ্রাম, সাইমন কমিশন, গোলটেবিল বৈঠক, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, সংখ্যালঘু সমস্যা প্রভৃতি নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে বিক্ষোভ আলোচ্য দশকের (১৩ মার্চ ১৯২২—২১ মার্চ ১৯৩২) ভারতকে উত্তাল করে তুলেছিল, তা থেকে রবীন্দ্রনাথ দূরে সরে থাকতে পারেননি। গান্ধীজীর অনশন ব্রতের সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন কবি। হিজলীর বন্দিদের নির্মম হত্যার প্রতিবাদে কবিকণ্ঠে দৃপ্ত প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান নিয়েও তিনি না ভেবে পারেননি। সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে এবং বাংলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, তরুণ সুভাষচন্দ্র, স্বদেশপ্রাণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।
>
> চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ভূমিকা, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৩

স্বদেশে ও বহির্বিশ্বে ঘটে-যাওয়া নানা ঘটনার প্রভাব পড়েছে *কালান্তর*-এর নানা প্রবন্ধে।

'কালান্তর' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাংলা রেনেসাঁসে ইংরেজের ভূমিকার সদর্থক ও নঞর্থক—উভয় দিকই তুলে ধরেছেন। ইংরেজদের আগমনকে রবীন্দ্রনাথ 'নব্য য়ুরোপের চিত্তপ্রতীক-রূপে' দেখতে চেয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার।.....য়ুরোপের চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে, আমাদের সামনে এনেছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ;' ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের ফলে আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন হল, যাকে আমরা বলতে পারি রেনেসাঁস। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলেম তা নয়, আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ; শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল-মোচনের ঘোষণা; দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে, আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন।
>
> *কালান্তর*, 'কালান্তর', পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১৭,
> বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ১৬-১৭

রবীন্দ্রনাথ অনেক আশা নিয়েই বললেন :

> য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা; আর-এক দিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না। *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ১৭

রবীন্দ্রনাথ দেখলেন প্রাচ্য জাতিরাও নবযুগের দিকে যাত্রা করছে :

> বহু কালের সুপ্ত এশিয়ায় দেখা দিল জাগরণের উদ্যম। পাশ্চাত্যেরই সংঘাতে সংস্রবে জাপান অতি অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বজাতি-সংঘের মধ্যে জয় করে নিলে সম্মানের অধিকার। অর্থাৎ জাপান বর্তমানকালের মধ্যেই বর্তমান, অতীতে ছায়াচ্ছন্ন নয়, সে তা সম্যক্‌রূপে প্রমাণ করল। দেখতে পেলেম, প্রাচ্য জাতিরা নবযুগের দিকে যাত্রা করেছে।
>
> *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ১৯-২০

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর সিদ্ধান্তে এলেন :

> অনেক দিন আশা করেছিলুম, বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে আমাদেরও সামঞ্জস্য হবে, আমাদেরও রাষ্ট্রজাতিক রথ চলবে সামনের দিকে; এবং এও মনে ছিল যে, এই চলার পথে টান দেবে স্বয়ং ইংরেজও। অনেক দিন তাকিয়ে থেকে অবশেষে দেখলুম, চাকা বন্ধ।...এই সুবৃহৎ দেশে শিক্ষার বিধান, স্বাস্থ্যের বিধান অতি অকিঞ্চিৎকর; দেশের লোকের দ্বারা নব নব পথে ধন-উৎপাদনের সুযোগ-সাধন কিছুই নেই—অদূর ভবিষ্যতেও তার যে সম্ভাবনা আছে তাও দেখতে পাই নে—কেননা দেশের সম্বল সমস্তই তলিয়ে গেল ল এবং অর্ডরের প্রকাণ্ড কবলের মধ্যে। য়ুরোপীয় নবযুগের শ্রেষ্ঠ দানের থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়েছে য়ুরোপেরই সংস্রবে। নবযুগের সূর্যমণ্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মতো রয়ে গেল ভারতবর্ষ।
>
> *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ২০

রবীন্দ্রনাথ এভাবেই ইংরেজের সমালোচনা করেছেন সম্পূর্ণ অনাবৃতভাবেই। এই হল বাংলা রেনেসাঁসে ইংরেজের ভূমিকার নঞর্থক দিক। ভারতবর্ষের ন্যূনতম উন্নতির পথ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য, প্রশস্ত না-করে 'ল এবং অর্ডর'-এর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন স্বয়ং ইংরেজ, যা মোটেই ইংরেজদের সদর্থক চিন্তার পরিচয় নয়।

*কালান্তর* গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয় চরকা-নীতি, রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজি বিতর্ক। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আলোচনা চলছে। শান্তিনিকেতনেও উক্ত আন্দোলনের মতাবলম্বীর সংখ্যা অল্প নয়। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজির ফতোয়াকেই দেশবাসী বিনা বিচারে মেনে চলার পথ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই মনোভাবের পরোক্ষ সমালোচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে :

> পশ্চিমদেশে পোলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে কখন থেকে? অর্থাৎ, কখন থেকে দেশের সকল লোক এই কথা বুঝেছে যে, রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেছে। যখন থেকে তারা জেনেছে সেই নিয়মই সত্য যে নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হয় না।...কিন্তু, নিজের

বুদ্ধিবিভাগে যে লোক কর্তাভজা, পোলিটিক্যাল বিভাগেও কর্তাভজা হওয়া ছাড়া তার আর গতি নেই।

'শিক্ষার মিলন', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ১৬৮-১৭০

জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল *রবিজীবনী*-র অষ্টম খণ্ডে জানিয়েছেন 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে সরাসরি কোনো বক্তব্য প্রকাশ করেননি। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধ পাঠের পরে সংবাদপত্রে ও মৌখিক আলোচনায় তাঁর সম্পর্কে এমন মন্তব্য করা শুরু হল যে, রবীন্দ্রনাথ মনে করলেন এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করে জানানোই ভালো। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'সত্যের আহ্বান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে ১৩ ভাদ্র (সোম ২৯ আগস্ট) ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে একটি সভায় পাঠ করলেন। প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ *সাধনা, বঙ্গদর্শন,* বঙ্গভঙ্গ ও বিশ্বের আন্দোলনের সময়ে তাঁর রাজনৈতিক মতামতের বিবরণ দিয়ে ভারতের বর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজির আবির্ভাবকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানালেন :

> বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিক্যাল নেতারা ইংরেজি-পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকান নি,....এমন সময়ে মহাত্মা গান্ধি এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরিবের দ্বারে—তাদেরই আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়।...তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম। কেননা, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে?....সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহুদিনের রুদ্ধ দ্বারে যে মুহূর্তে এসে দাঁড়াল অমনি তা খুলে গেল। কারো মনে আর কার্পণ্য রইল না, অর্থাৎ সত্যের স্পর্শে সত্য জেগে উঠল।
>
> 'সত্যের আহ্বান', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ২০১

এই সংবাদ বিদেশে যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌছেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের 'বড়ো আনন্দে' মনে হয়েছিল যে, 'এইবার এই উদ্‌বোধনের দরবারে আমাদের সকলেরই ডাক পড়বে, ভারতবাসীর চিত্তে শক্তির যে বিচিত্র রূপ প্রচ্ছন্ন আছে সমস্তই প্রকাশ হবে।' কিন্তু দেশে ফিরে হতাশ হয়ে তিনি দেখেছেন, 'কথা উঠেছে সমস্ত দেশের বুদ্ধিকে চাপা দিতে হবে, বিদ্যাকেও। কেবল বাধ্যতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। কার কাছে বাধ্যতা? মন্ত্রের কাছে, অন্ধবিশ্বাসের কাছে।' দুঃখের বিষয়, এই মন্ত্রও গান্ধীজির দেওয়া। যুক্তিবিচারের দ্বারা নয়, অন্তরের বাণী থেকে তিনি দেশবাসীকে উপদেশ দিয়েছিলেন—বিদেশি বস্ত্র অপবিত্র, সুতরাং সেই বস্ত্র পুড়িয়ে চরকায় সুতো কাটতে হবে; আর এই উপদেশ পালন করলে এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ অবশ্যই

ভারতবাসীর করায়ত্ত হবে। আশ্চর্যের কথা, দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষ এই অন্ধ বিশ্বাসের প্রলোভনে নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনায়াসে জলাঞ্জলি দিয়েছে এবং যারা একথা মানতে রাজি নয়, তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য, তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই।'

গান্ধীজির ডাকের মধ্যে শক্তি ছিল, কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটি সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো।' রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন : 'এই ডাক কি সেই 'অয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'?' এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক?' এখানেই রবীন্দ্রনাথ থেমে থাকেননি, তিনি অনাবৃতভাবে 'যুক্তি'র স্বপক্ষে মত প্রতিষ্ঠা করেছেন, কোনো 'উক্তি'র স্বপক্ষে নয়। 'স্বরাজ' সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্বচ্ছ। স্বরাজের ভিত্তি আমাদের মনের উপর। 'স্বরাজ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্পষ্ট :

> আমাদের দেশেও সেই চিত্তের বিকাশের উপরেই স্বরাজ দাঁড়াতে পারবে। তার জন্যে কোনো বাহ্য ক্রিয়া, বাহ্য ফল নয়, জ্ঞান বিজ্ঞান চাই। দেশের চিত্তপ্রতিষ্ঠিত এই স্বরাজকে অল্পকাল কয়েকদিন চরকা কেটে আমরা পাব, এর যুক্তি কোথায়? যুক্তির পরিবর্তে উক্তি তো কোনোমতেই চলবে না।...এই-যে আজ বস্ত্রাভাবে লজ্জাকাতরা মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করে কাপড় পোড়ানো চলছে, কোন্ বাণীতে দেশের কাছে আজ তার তাগিদ আসছে? সে কি ঐ দৈববাণীতে নয়?
>
> 'সত্যের আহ্বান', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ২১০-২১১

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের কর্মনীতির বিরোধিতা করেছেন যুক্তির ভিত্তিতে।

প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথের মতো আত্মীকরণ আর কেউ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। ভারতের শাশ্বত ভাবধারাকে আত্মস্থ করে কবি নিজস্ব রস মাধুর্যে মণ্ডিত করে রচনায় প্রকাশ করেছেন। তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ বিশ্বভারতী। প্রাচীন তপোবনের শিক্ষাদর্শকে রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীতে পুনঃস্থাপিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিশ্বভারতীর আদর্শের কথা প্রচার করলেন :

> মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আর-এক মহাদেশে ব্যাপ্ত, তার মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যতক্ষণ না ঘটবে ততক্ষণ এই

কারণের নিবৃত্তি হবে না। এখন থেকে যেকোনো জাত নিজের দেশকে একান্ত স্বতন্ত্র করে দেখবে, বর্তমান যুগের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটবে, সে কিছুতেই শান্তি পাবে না। এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের জন্যে যে চিন্তা করতে হবে তার সে চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎজোড়া। চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা করাই বর্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা।

'সত্যের আহ্বান', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ২১৪

*কালান্তর* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ শাসনের সমালোচনা করেছেন। ইংরেজ শাসনের সমালোচনারও দুটি ভাগ—সদর্থক ও নঞর্থক। ইংরেজশাসনের সমালোচনা আমরা প্রথমে করি সদর্থক হিসেবে :

আজ আমরা মরতে মরতেও ইংরেজ-শাসনের বিচার করতে পারি ন্যায়-অন্যায়ের আদর্শে; এ কথা মনে করি নে, কোনো দোহাই পেড়ে শক্তিমানকে অসংযত শক্তি সংহরণ করতে বলা অশক্তের পক্ষে স্পর্ধা। বস্তুত ন্যায়-আদর্শের সর্বভূমীনতা স্বীকার ক'রে এক জায়গায় ইংরেজ-রাজের প্রভূত শক্তি আপনাকে অশক্তের সমানভূমিতেই দাঁড় করিয়েছে।

'কালান্তর', *কালান্তর* তদেব, পৃ. ১৬

'স্বাধিকারপ্রাপ্তঃ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজশাসনের সমালোচনা করেছেন। এখানে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন, দেড়শো বছরের ইংরেজশাসনে ইংরেজ ভারতবর্ষকে আগাগোড়া দখল করে বসেছে। এ শাসনে ভারতের যে কল্যাণ নেই এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশ স্পষ্টবাদী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'এত কালের সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিম মেলে নাই, বরং তাদের মাঝখানের ফাঁক বাড়িয়াই চলিল।' ('স্বাধিকারপ্রমত্তঃ', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ১১৪)। পূর্ব ও পশ্চিমের না মেলার কারণও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন—ইংরেজের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি নেই, এই কারণেই ইংরেজরা পূর্ব ও পশ্চিমের মেলবন্ধন ঘটাতে অক্ষম। ভারতে সেই আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধের সাধনা আজকের দিনেই নিশ্চেষ্ট হয়নি। ভারতের দ্বারে পশ্চিমের আঘাতে রামমোহন রায়-ই সর্বপ্রথম সাড়া দিয়েছিলেন। রামমোহন ভারতের তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই—অর্থাৎ পরমাত্মায় সকল আত্মার ঐক্য এই বিশ্বাসের মধ্যে—সর্বমানবের মিলনের সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন। ভিক্ষার দানে রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা চান না, স্বাধীনতা হল অন্তরের সামগ্রী। ইউরোপ কেন আমাদের মুক্তি দিতে পারে না তার কারণও রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেছেন :

য়ুরোপ কেন আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না? যেহেতু তাহার নিজের মন মুক্তি পায় নাই। তার লোভের অন্ত কোথায়? যে-হাত

দিয়া সে কোনো সত্যবস্তু দিতে পারে লোভে তার সে হাতকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—সত্য করিয়া তার দিবার সাধ্যই নাই, সে যে রিপুর দাস। যে মুক্ত সেই মুক্তি দান করে।

'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ১২৪

রবীন্দ্রনাথ সেইসঙ্গে সতর্কবাণীটিও উচ্চারণ করেছেন : 'তপস্যার বলে আমরা সেই দানের অধিকার পাইব, ভিক্ষার অধিকার নয়, এ কথা যেন কোনো প্রলোভনে না ভুলি। মানুষ যেহেতু মানুষ এইহেতু বস্তুর দ্বারা সে বাঁচে না, সত্যের দ্বারাই সে বাঁচে।' ('স্বাধিকারপ্রমত্তঃ', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ১২৬)

গান্ধীজি পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান ও যন্ত্রসভ্যতার বিরোধী ছিলেন, রবীন্দ্রনাথও মানুষের মনের উপর যন্ত্রের আধিপত্যকে স্বীকার করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো করে তুলে পশ্চিম সমাজে মানবসম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে।' ('শিক্ষার মিলন', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ১৭৭) প্রায় দেড় বছর ইউরোপ ও আমেরিকায় অবস্থানের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জেনেছেন, পশ্চিমের মনীষীরা আজ ভয় পেয়ে বলেছেন, যে- দুর্বুদ্ধি থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের মতো দুর্ঘটনার উৎপত্তি এত দুঃখের পরেও তার নাড়ি বেশ তাজা আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'এই দুর্বুদ্ধির নাম ন্যাশনালিজম্, দেশের সর্বজনীন আত্মম্ভরিতা। এ হল রিপু, ঐক্যতত্ত্বের উল্টো দিকে, অর্থাৎ আপনার দিকটাতেই এর টান।' ('শিক্ষার মিলন', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ১৮৬)। এর প্রতিকারের পথও রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন :

স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা, কালকের দিনের ইতিহাস সর্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে। যে-সকল রিপু, যে-সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচারপদ্ধতি এর প্রতিকূল তা আগামীকালের জন্যে আমাদের অযোগ্য করে তুলবে।

'শিক্ষার মিলন', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ১৮৭

*কালান্তর* গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির চরকানীতি ও তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) রাষ্ট্রনৈতিক মত নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের নিজের দেশ যে নিজের হয়নি তার প্রধান কারণ এই নয় যে, এদেশ বিদেশের শাসনাধীনে। কেন আমাদের দেশ আমাদের হয়নি, তার কারণ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা আমাদের দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা-দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলতে পারিনি,

একে অধিকার করতে পারিনি। নিজের বুদ্ধি, প্রাণ, প্রেম দিয়ে যাকে আমরা গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি; তার 'পরে অন্যায় আমরা মরে গেলেও সহ্য করতে পারিনে। সত্যকার প্রেম অনুকূল-প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই সেবার ভিতর দিয়ে স্বতঃই আত্মত্যাগ করতে উদ্যত হয়—বাধা পেলে তার উদ্যম বাড়ে বৈ কমে না। যেসব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধসংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শতখণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্টা-দ্বারা দূর করবার কোনো উদ্‌যোগ করিনি। কেবলই নিজেকে এবং অন্যকে এই বলে ভোলাই যে, যেদিন স্বরাজ হাতে আসবে তার পরদিন থেকে সমস্ত আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। অর্থাৎ আমরা আমাদের কর্তব্যকে সুদূরে ঠেকিয়ে রেখেছি। এবং এই কর্তব্যকে 'সুদূরে ঠেকিয়ে রাখা—অকর্মণ্যতার শূন্যগর্ভ কৈফিয়ত রচনা করা—নিরুৎসক নিরুদ্যমে দুর্বল চিত্তেরই পক্ষে সম্ভব।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। কারণ, সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা—গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনকী স্বদেশি রাজার রাজত্ব পরিবর্তনেও দেশের আত্মরক্ষা হয়েছে—যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেছে—তার অন্নবস্ত্র ধর্মকর্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের; রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি।' ('রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ৩৪৪)। পাশ্চাত্য রাজার শাসনে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে। এর ফলে

> গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল, রাজশাসন তাকে অধিকার করলে। যখন থেকে এই অধিকার পাকা হয়ে উঠল তখন থেকে গ্রামে গ্রামে দিঘিতে গেল জল শুকিয়ে, জীর্ণ মন্দিরে—শূন্য অতিথিশালায় উঠল অশথ গাছ, জাল-জালিয়াতি, মিথ্যা- মকদ্দমাকে বাধা দেবার কিছু রইল না, রোগে তাপে দৈন্যে অজ্ঞানে অধর্মে সমস্ত দেশ রসাতলে তলিয়ে গেল।
>
> 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ৩৪৫।

এর থেকে নিবৃত্তির পথরেখাও রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন :

> স্বদেশী-সমাজে তাই আমি বলেছিলুম ইংরেজ আমাদের রাজা কিম্বা আর-কেউ আমাদের রাজা এই কথাটা নিয়ে বকাবকি করে সময় নষ্ট

> না করে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, নিজের দেশকে নিজে সত্যভাবে অধিকার করবার চেষ্টা সর্বাগ্রে করতে হবে। দেশের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তিকে সংঘবদ্ধ আকারে কেমন করে দেশে বিস্তীর্ণ করা যেতে পারে, স্বদেশী-সমাজে আমি তারই আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলুম।
>
> 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ৩৪৫-৩৪৬

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চরকানীতির সমালোচনা করেছেন। তিনি চান 'পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধন'। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য :

> আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা—এতে চিত্তশক্তির কোনো আহ্বান নেই। সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে আমন্ত্রণ সে তো কোনো বাহ্য প্রক্রিয়ার অন্ধ পুনরাবৃত্তির আমন্ত্রণ হতে পারে না। তার জন্যে আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধন;
>
> 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ৩৪৬

এখানেই রবীন্দ্রনাথ থেমে থাকেননি, তিনি আরও বলেছেন, চরকাই স্বরাজ সাধনার একমাত্র রাজপথ নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন :

> চিন্তাবিহীন মূঢ় বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য করেই কি এত কাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমরা মনকে কর্মকে আড়ষ্ট করে রাখি নি? আমাদের দেশের সব চেয়ে বড়ো দুর্গতির কারণ কি তাই নয়? আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বুদ্ধি চাই নে, বিদ্যা চাই নে, প্রীতি চাই নে, পৌরুষ চাই নে, অন্তর-প্রকৃতির মুক্তি চাই নে—সকলের চেয়ে বড়ো করে একমাত্র করে চাই, চোখ বুজে, মনকে বুজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন চালানো হয়েছিল তারই অনুবর্তন করে? স্বরাজসাধন যাত্রার এই হল রাজপথ?
>
> 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ৩৪৬

এরপর রবীন্দ্রনাথ নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন : 'বস্তুত যখন সমগ্রভাবে দেশের বুদ্ধিশক্তি কর্মশক্তি উদ্যত থাকে তখন অন্য দেশ থেকে কাপড় কিনে পরলেও স্বরাজের মূলে আঘাত লাগে না।' ('রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ৩৪৬-৩৪৭)—এভাবে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির চরকানীতির সমালোচনা করেছেন যুক্তিপূর্ণভাবে।

রাষ্ট্রনৈতিক মত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য :

> যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করি নে। আপন পক্ষের কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে আছি বলেই অপর পক্ষের কথা নিয়ে এত অত্যন্ত অধিক করে আমরা আলোচনা করে থাকি। তাতে শক্তিহ্রাস হয়। স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারব, তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই।
>
> 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ৩৪৭

শিক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন, ভেবেছেন নানা সময়ে, তার লিপিবদ্ধ রূপ দেখি *শিক্ষা* (১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ) নামক গ্রন্থে এবং বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন আলোচনার সূত্রে। বিদ্যার জোরে যে বিশ্ব জয় করা যায় এবং পশ্চিমের লোক যে এ বিষয়ে সফল, একথা রবীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধায় বলেছেন : '...পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা, বিদ্যা যে সত্য।' ('শিক্ষার মিলন', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ১৬৬) আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা কী—এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য : 'স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা।' ('শিক্ষার মিলন', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ১৮৭) শিক্ষার সংগতি হল শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্তমান যুগের শিক্ষার সংগতি হওয়া চাই।' ('শিক্ষার মিলন', *কালান্তর* তদেব, পৃ. ১৮৬) রাশিয়ায় গিয়ে ওখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এদের কাছে শিক্ষার স্থান সবার উপরে, আমাদের দেশে প্রধান গুরুত্ব 'ল অ্যান্ড অর্ডার'। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> তাই যখন শুনলুম, রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অঙ্ক থেকে প্রভূতপরিমাণে বেড়ে গেছে, তখন মনে মনে ঠিক করলুম, ভাঙা শরীর আরো যদি ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেছে, অশক্তকে শক্তি দেবার একটিমাত্র উপায় শিক্ষা—অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই 'পরে নির্ভর করে। ফাঁকা 'ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার' নিয়ে না ভরে পেট, না ভরে মন। অথচ তার দান দিতে গিয়ে সর্বস্ব বিকিয়ে গেল।
>
> *রাশিয়ার চিঠি*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী,
> পুনর্মুদ্রণ: অগ্রহায়ণ ১৪০০, পৃ. ২৮২

রাশিয়ার শিক্ষাবিধির গলদ নিয়েও রবীন্দ্রনাথ সুতীক্ষ্ণ বিচারবোধের পরিচয় দিয়েছেন:

> সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে—কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না—সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে। 'রাশিয়ার চিঠি', তদেব, পৃ. ২৭৫

রবীন্দ্রনাথ চান শিক্ষার মিলন তথা পূর্ব-পশ্চিমের মিলন। এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি চয়ন করে নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পূর্ব-পশ্চিমের শিক্ষার, মিলনের, অভাবের পরিণতিও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন: 'এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জীব; আর এই মিলনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।' ('শিক্ষার মিলন', তদেব, পৃ. ১৮৩)। কীভাবে লোকসাধারণের চেতনার অধিকার প্রশস্ত হবে তার সূত্রও রবীন্দ্রনাথ 'লোকহিত' প্রবন্ধে নির্দেশ করেছেন : লোকসাধারণের পরস্পরের মধ্যে একটা যোগ দরকার। অর্থাৎ তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা রাস্তা চাই। সেটা যদি রাজপথ না-হয় তো অন্তত গলি রাস্তা হওয়া চাই। এর গলির রাস্তার ব্যাখ্যাও রবীন্দ্রনাথ করেছেন : 'লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা।' ('লোকহিত', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ৪৬) এবং এই লেখাপড়াটা কেমন তার ব্যাখ্যাও রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন : 'কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে শেখা।' এই ন্যূনতম লেখাপড়া শিখলেই যে লোকসাধারণের চেতনার অধিকার প্রশস্ত হবে, এর ব্যাখ্যাও রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন:

> লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কি শিখিবে ও কতখানি শিখিবে সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে, এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে, তাহার চেতনার অধিকার যে চারি দিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে, এইটেই গোড়াকার কথা।
> 'লোকহিত', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ৪৬

*কালান্তর* রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের সমৃদ্ধতম প্রবন্ধগ্রন্থ। এই প্রবন্ধগ্রন্থের অন্যতম মূল সুর মানবতাবাদ (Humanism)। পূর্বেই বলেছি, যদিও এই প্রবন্ধগ্রন্থে সমকালীন দেশে ও বহির্বিশ্বে ঘটে-যাওয়া নানা বিষয়ের প্রতি তিনি আলোকসম্পাত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধগ্রন্থে ইংরেজ সরকারের আমলাতন্ত্রীয় ঔদ্ধত্য ও হৃদয়হীন রাজ্যশাসননীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। এখানে তিনি বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী

নীতিকে নিষ্ঠুর শয়তানের সরকার আখ্যা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, ইংরেজ শাসনতন্ত্রের গতিপ্রকৃতি গুণাগুণ সূক্ষ্মভাবে বিচার করেছেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ২১ মে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উৎকণ্ঠিত বেদনাদীর্ণ হয়ে এন্ড্রুজকে একটি পত্রে লেখেন :

> I am struggling on my way through wilderness...My feet is bleeding, and I am toiling with panting breath. Wearied, I like down upon the dust and cry and call upon His name. I know that I must pass through death. God knows it is the death pang that is tearing open my heart.
>
> প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: *রবীন্দ্রজীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৭, পৃ. ৪৬৩-৪৬৪

উগ্র জাতীয়তাবাদকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই সমর্থন করেননি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ) পর থেকে তাঁর জাতীয় চেতনায় আন্তর্জাতিকতার সুর স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। দেশবাসীর প্রতি ইংরেজশাসকদের ঘৃণা ও জুগুপ্সার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্র-কথিত ছোটো ইংরেজ যখন জালিয়ানওয়ালাবাগে বর্বরোচিত মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করে ভাইসরয়কে যে কঠোর পত্র লেখেন সেখানে জনতার কথাই উচ্চারিত হয় তাঁর নিজের কণ্ঠে।

বিশ্বের যে-অংশেই পশুশক্তির কাছে নিরীহ অসহায় জাতিসমূহ অত্যাচারে মর্মপীড়িত হয়েছে, সেখানেই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। জাপানে গিয়ে তিনি নবজাগ্রত উগ্র জাপানি জাতীয়তাবাদের তীব্র নিন্দা করেছেন। লেখনী ধারণ করেছেন তিনি আমেরিকার নিগ্রোদের উপর অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে। জাপানি সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুর শাসনে পর্যুদস্ত কোরিয়বাসীদের প্রতিও রবীন্দ্রনাথের সমবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মর্মকথা রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর', 'লড়াইয়ের মূল', 'বাতায়নিকের পত্র', 'ছোটো ও বড়ো' প্রভৃতি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন। *কালান্তর* প্রবন্ধগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত মুক্তবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছেন। জোর দিয়েছেন তিনি আত্মশক্তির উপর। তিনি কামনা করেছেন মঙ্গলময় সমাজের। তিনি শক্তি নয়, চেয়েছেন পূর্ণতা ; বিরোধ নয়, চেয়েছেন মিলন। পাশ্চাত্যের শক্তিপূজার চেয়ে ভারতবর্ষের শান্তিপ্রিয়তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে শ্রেয় এবং কাঙ্ক্ষিত বলে মনে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সংকট'-এর প্রকৃত কারণ খুঁজেছেন এবং সেই সংকট উত্তরণের উপায় নির্দেশ করেছেন। সভ্যতার সংকট-এর অন্যতম একটি কারণ

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির আগ্রাসন নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন :

ক. চৈনিকদের মতন এত বড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থসাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেনবিষে জর্জরিত করে দিলে, এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে।

'সভ্যতার সংকট', *কালান্তর*, তদেব, পৃ. ৪১২

খ. এই অতীতের কথা যখন ক্রমশ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম, উত্তর-চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিপ্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যুবৃত্তিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিল!

'সভ্যতার সংকট', তদেব, পৃ. ৪১২-৪১৩

গ. পরে এক সময় স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গভর্নমেন্টের তলায় ইংলণ্ড কী রকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে।

'সভ্যতার সংকট', তদেব, পৃ. ৪১৩

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের সমালোচনা করেছেন অনাবৃতভাবে। এই ইউরোপ শুধুমাত্র ভারতবর্ষের উন্নতির বিপক্ষে ছিল এমন নয়, এই ইউরোপ ভারতবর্ষ ছাড়াও অন্যান্য দেশের উন্নতির পক্ষেও ছিল অন্তরায় এবং ছিল মানবতার বিরোধী। ইংরেজ জোর দিয়েছে Law and Order-এর উপর। এই Law and Order সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য : 'বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র।...সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি।' ('সভ্যতার সংকট', তদেব, পৃ. ৪১৪)। তবে রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসাবে ইংরেজ জাতির সদর্থক দিকও তুলে ধরেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি এন্ড্রুজের নাম করেছেন। এন্ড্রুজকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথ দেশ-বিদেশ ঘুরে স্বদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমতও গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য :

> রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবনের এক দীর্ঘসময় কেটেছিল দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে। বিদেশে তাঁর ব্যাপক ভ্রমণ দেশের স্বাধীনতার পক্ষে যে জনমত গঠনের সহায়ক হয়েছিল তার প্রমাণ উইল ডুরাণ্ডের এই উক্তি : 'You alone are sufficient reason why India should be free.'
>
> ভূমিকা, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, প্রথম খণ্ড, ১৩ মার্চ ১৯২২—২১ মার্চ ১৯৩২, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৯, আনন্দ পাবলিশার্স

'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যাওয়ার ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন : 'ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন-না-একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে।'

রবীন্দ্রনাথ আশাবাদী। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন পরিত্রাণকর্তা তার জন্মদিনে সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে আসবেন, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবেন এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আরও আশা করেছেন, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রা অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে, তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে, অগ্রসর হবে। প্রবন্ধ শেষে রবীন্দ্রনাথ 'মহামানব'-এর অপেক্ষায় নিজের আশার বাণী ব্যক্ত করেছেন :

> ...ঐ মহামানব আসে,
> দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
> মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
> সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
> নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
> এল মহাজন্মের লগ্ন।
>
> 'সভ্যতার সংকট', তদেব, পৃ. ৪১৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *কালান্তর* সম্পর্কিত গবেষণাধর্মী বই-এর একান্ত অভাব থেকেই আমাদের রবীন্দ্রনাথের *কালান্তর: একালের চোখে* শীর্ষক গ্রন্থের পরিকল্পনা। এই বইটি প্রকাশ করতে লাগল দীর্ঘ প্রায় দু-বছর। উক্ত গ্রন্থে যাঁরা নিষ্ঠা সহকারে ধৈর্য ধরে লিখেছেন তাঁদের সবাইকে যথাযোগ্য সম্মান জানাই।

রবীন্দ্রনাথের *কালান্তর* গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি সামনে রেখে কখনো প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে বিভিন্ন বিষয়ের সামগ্রিক আলোচনা, কখনো এসেছে প্রবন্ধ ধরে ধরে পর্যালোচনা ও পাঠভিত্তিক বিশ্লেষণ। প্রবীণ ও নবীন অধ্যাপকদের উক্ত লেখাগুলি তুলে দিলাম পাঠকদের হাতে। সাফল্য ও ব্যর্থতার দায় সম্পূর্ণই আমার। গ্রন্থটি প্রকাশনায় যিনি সাহায্য করেছেন তরুণ প্রকাশক অসীম কর (এ কে ডিস্ট্রিবিউটর, পুরুলিয়া)। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীগৌরদাস সাহা মহাশয়কে। তাঁর সহৃদয় সাহায্য ছাড়া এ গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হত না। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষাকর্মীবৃন্দ, আমার বাংলা বিভাগের সহকর্মী

অধ্যাপকবৃন্দ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারকবৃন্দ প্রমুখকে। এই গ্রন্থটি লোকসংস্কৃতিবিদ অবসরপ্রাপ্ত কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী মহাশয়কে উৎসর্গ করতে পেরে ভালো লাগছে। সর্বোপরি, *রবীন্দ্রনাথের কালান্তর : একালের চোখে* গ্রন্থটি যদি সাধারণ পাঠক, গবেষক ও ছাত্রছাত্রীদের সামান্যতম কাজে লাগে তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়।

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়,
পুরুলিয়া, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান,
বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

২৫ শে বৈশাখ
১৪২৪ বঙ্গাব্দ
৯ মে ২০১৭

# সূচি


ন্যায়দর্শের সর্বভূমিনতা, জ্ঞানের বিশ্বরূপ দর্শন
বরুণকুমার চক্রবর্তী ২৫

কালান্তর ও সমকালীন প্রেক্ষিত
শর্মিলা বাগচী ৩১

কালান্তর : একটি শৈলীগত সমীক্ষা
প্রকাশকুমার মাইতি ৪০

রবীন্দ্রনাথের মানবিক দৃষ্টিকোণ : প্রসঙ্গ 'কালান্তর'
মিলনকান্তি সৎপথী ৪৭

'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' : প্রসঙ্গ 'কালান্তর'
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩

ভাবুক রবীন্দ্রনাথের 'নারী' : ইতিহাস রচনার কলমে
ছন্দা রায় ৬৯

'সত্যের আহ্বান': রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অলকা চট্টোপাধ্যায় ৮০

'সত্যের আহ্বান'—গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ বিতর্ক
নন্দিতা বসু ৮৫

'বাতায়নিকের পত্র' মানববিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র
শুভঙ্কর রায় ৯৩

'সভ্যতার সংকট' : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ১১৫
কৃষ্ণা নন্দী (ভৌমিক)

রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' গ্রন্থের 'ছোটো ও বড়ো' : কিছু কথা ১২২
রজতকিশোর দে

প্রসঙ্গ শক্তিপূজা : দুর্বলতা ও শক্তি ১৩১
ফটিকচাঁদ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' প্রবন্ধ : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ১৪৪
নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা : প্রসঙ্গ 'শিক্ষার মিলন' ১৫৪
নাড়ুগোপাল দে

রবীন্দ্রনাথের 'লোকহিত' ১৭০
সুব্রত দাস

'লোকহিত' : কিছু ভাবনা, কিছু অনুভব ১৮৪
মুনমুন ঘোষ

'বিবেচনা ও অবিবেচনা' : অবিবেচনার জয়গান ১৯৪
সোনালি মুখার্জি

লেখক পরিচিতি ২০৭